অধ্যায়
১৮

কৃষি সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ

কৃষি সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ

১৮.১ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিএই'র অগ্রযাত্রা এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সাফল্যের বর্তমান দৃশ্যপট

জলবায়ু পরিবর্তন, বিরূপ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ইত্যাকার পরিস্থিতিতে দেশের ১৬ কোটি মানুষের খোরাক যোগানোই বড় চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আরও যুক্ত রয়েছে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান ইত্যাদি। ডিএই এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অগ্রযাত্রায় যথার্থ দায়-ভার কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের রেকর্ড সৃষ্টিতে এক অনন্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মাঝেও কৃষি উন্নয়ন ও সাফল্যের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার আংশিক তথ্য-চিত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল:

১৮.১.১ গত ৪৪ বছরে (১৯৭১-২০১৫) ধান চাষের জমি কমেছে ১৮%, তথাপিও চাল উৎপাদন বেড়েছে ৩.১৬ গুণ; আলু চাষের জমি বেড়েছে ৫.৫ গুণ আর উৎপাদন বেড়েছে ১০.৯ গুণ; গম ও ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১২.২৫ গুণ ও ৭৫৭ গুণ; ২৫% এর কম পাট আবাদকৃত জমিতে উৎপাদন বেড়েছে ১৫% (বিবিএস)।

১৮.১.২ গত দেড় দশকের (১৯৯৫-২০১০) হিসাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে কৃষি খাতে মোট উৎপাদিকা শক্তি সবচেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি (টিএফপি) ২.৭% - যা চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামের চেয়ে বেশি (বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন)।

১৮.১.৩ গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কৃষি খাতের অবদান অভাবনীয়। ১০ বছরের (২০০০-২০১০) ব্যবধানে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে ২১.৬%, বিগত ২০০০ সনে কর্মসংস্থান ছিল ১ কোটি ৮৭ লক্ষ জনের আর ২০১০ সনে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২৭ লক্ষ। তথ্যমতে ২০১৩ সনের হিসাবে গ্রাম এলাকায় যত কর্মসংস্থান হয়েছে তার ৩৯.৬% এসেছে কৃষি থেকে (বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন)।

১৮.১.৪ বাংলাদেশে বর্তমানে ৮৭% গ্রামীণ পরিবারের আয়ের উৎস কৃষি। কৃষি খাতে ১০% আয় বাড়লে অকৃষি খাতে বাড়ে ৬%। এক দশকের (২০০০-২০১০) ব্যবধানে কৃষি খাত থেকে গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে, ২০০০ সালে ছিল ৬১ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা আর ২০১০ সনে এসে দাঁড়ায় ৯১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা (বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন)।

১৮.১.৫ বিগত এক যুগে কৃষিতে নারীর অংশ গ্রহণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় বলা হচ্ছে- গত এক যুগে বাংলাদেশে "কৃষির নারীকরণ" হয়েছে (প্রথম আলো ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫)। ইফপ্রি'র জরিপ অনুযায়ী কুমড়া আর লাউ চাষিদের ৪২% আর টমেটো চাষিদের ৩৮% নারী এবং ধান মাড়াই, শুকানো,

সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণের ৫৮-৭১% নারীর ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন ও কৃষিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এবং খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

১৮.১.৬ গত পাঁচ বছরে মংগা পীড়িত এলাকায় একটি পরিবারের বার্ষিক আয় বেড়েছে ১২০%, ২০০৮ সনে ছিল ৩৫ হাজার ৪০০ টাকা আর ২০১৩ সনে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮ হাজার ১০০ টাকা। মাত্র পাঁচ বছরেই চিত্র পাল্টে মংগা পীড়িত তথা উত্তর বঙ্গের মানুষ এখন তিন বেলা খেতে পারছে (পিকেএসএফ)।

১৮.১.৭ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত বা নিম্ন আয়ের দেশের কালিমা ঘুচিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এতে কৃষি খাতের উন্নয়ন একটি বড় নিয়ামক।

১৮.১.৮ ডিএই এর রয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলায় সাফল্য। দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্ক ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমসহ কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের কারণে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি বহুলাংশে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে।

১৮.১.৯ ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নজিরবিহীন। এফএও এর প্রতিবেদন অনুযায়ী- ২০০০-২০১০ সন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন বেড়েছে ১১.৪%, আর হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে ১০%। উৎপাদনের এ দুই দিকেই বাংলাদেশের ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিশ্বে সর্বোচ্চ।

১৮.১.১০ কীটনাশক কারিগরী উপদেষ্টা কমিটির সূত্রমতে - কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করে জৈব ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ডিএই এর একটি বড় অগ্রগতি। এ অগ্রগতির কারণে গত তিন বছরে কীটনাশকের আমদানি প্রায় এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে।

১৮.১.১১ ইফপ্রি প্রকাশিত 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে-ক্ষুধা নির্মূলে বাংলাদেশ ১৯৯০ সাল থেকে এ সময়কালে দ্বিগুণ সাফল্য দেখিয়েছে।

১৮.১.১২ কৃষি খাতে বাংলাদেশের সফলতা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। এত কম আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা এবং সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে তুলেছে। এতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে, খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত হচ্ছে। (এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি)।

১৮.২ কৃষির উন্নয়ন ধারায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

ডিএই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ নিয়েই কৃষির উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখেছে। এরই মাঝে সময়ের বিবর্তন ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জের নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আগামী দিনের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েই ডিএই কাজ করে যাবে।

কৃষি উন্নয়ন তথা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জের সারবত্তা নিম্নে দৃক্‌পাত করা হল:

১৮.২.১ কৃষি জমি অকৃষি খাতে রূপান্তর প্রতিরোধ

তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয় যে ১৯৭৬ সনে দেশে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৯৭,৬১,৪৫০ হেক্টর যা ২০০০ সনে এসে দাঁড়ায় ৯৪,৩৯,৫৪১ হেক্টর এবং ২০১০ সনে ৮৭,৫১,৯৩৭ হেক্টর; অর্থাৎ ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত কৃষি জমির বার্ষিক গড় হ্রাস ১৩,৪১২ হেক্টর বা ০.১৩৭% এবং ২০০০ থেকে ২০১০ সন পর্যন্ত বার্ষিক গড় হ্রাস ৬৮,৭৬০ হেক্টর বা ০.৭২৪% (এসআরডিআই)।

কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ধারায় এটি একটি ভয়াবহ হুমকী। উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষি জমি অকৃষি খাতে রূপান্তর প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিএই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ।

১৮.২.২ ক্রমঃহ্রাসমান আবাদী জমি হতে ক্রমঃবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%; সে অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বার্ষিক ০.৭২৪% হারে ক্রমঃহ্রাসমান জমি হতে এত বিপুল সংখ্যক বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে ডিএই-কে যথাযথ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৮.২.৩ পরিবর্তিত জলবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ। এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতি শস্য মৌসুমেই বিভিন্ন প্রকার অপ্রতিরোধ্য দুর্যোগ যেমন-বন্যা, খরা, মৌসুমী তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতে তারতম্য, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির আধিক্য এ দেশের কৃষিকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিষয়ে ডিএই এর সর্বস্তরের কর্মীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ যথাযথ পরিকল্পনা/কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনায় ডিএই-কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

১৮.২.৪ লবণাক্ততার ঝুঁকি মোকাবিলা করে দক্ষিণাঞ্চলকে শস্য ভান্ডারে পরিণতকরণ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে মোট জমির ২৭ ভাগ, আর আবাদী জমির এক তৃতীয়াংশ। এসআরডিআই এর তথ্য মতে- ১৯৭৩ সনে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার হেক্টর, ২০০৯ সনে যা এসে দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার হেক্টরে। অর্থাৎ লবণাক্ততা ধেঁয়ে ধেঁয়ে উজানমুখী। লবণাক্ততা প্রধানতঃ শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মে) দেখা দেয়। দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার পাশাপাশি সেচ পানির সংকটও ভয়াবহ। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচন ও সম্প্রসারণ, উপযোগী শস্য বিন্যাস প্রবর্তন, ব্যবস্থাপনার

মাধ্যমে লবণাক্ত ভূমি ফসল চাষের উপযোগীকরণ, সেচ ব্যবস্থা সৃজন ও উন্নয়ন, অঞ্চল উপযোগী বিশেষায়িত চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ, আউশ ধান চাষে গুরুত্বারোপ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, রবি মৌসুমে বিশাল পতিত জমি আবাদের আওতাভুক্তকরণ, ভাসমান কৃষি ইত্যাদি কার্যক্রমের কর্মকৌশল উদ্ভাবন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ডিএই এর সকল সম্প্রসারণ কর্মীকে সচেষ্ট হতে হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলকে দেশের নব্য শস্য ভাণ্ডারে পরিণতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

১৮.২.৫ কৃষি জমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

মাটিতে ক্রমঃহ্রাসমান জৈব পদার্থ কৃষিকে হুমকীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের সীমিত ফসলী জমির মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর অর্থাৎ ৪২% জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অতি নিম্ন থেকে নিম্ন। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা বিবর্জিত বিরামহীনভাবে উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষের কারণে মাটিতে নিউট্রিয়েন্টের ক্রমঃঘাটতিও কৃষি ক্ষেত্রে সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে ফসফরাস, পটাসিয়াম, গন্ধক, দস্তা, বোরণ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অতি নিম্ন ও নিম্ন মাত্রার ঘাটতিযুক্ত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭ লক্ষ (কৃষি জমির প্রায় ৪৩%), ২৭ লক্ষ ২০ হাজার (কৃষি জমির প্রায় ৩১%), ৩৩ লক্ষ ১ হাজার (কৃষি জমির প্রায় ৩৮%) , ২৭ লক্ষ ৫৫ হাজার (কৃষি জমির প্রায় ৩২%), ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার (কৃষি জমির প্রায় ২৮%), ৩ লক্ষ (কৃষি জমির প্রায় ৪%) ও ৩ লক্ষ (কৃষি জমির প্রায় ৪%) হেক্টর ছাড়িয়ে যাচ্ছে (এসআরডিআই)।

অপরদিকে গঙ্গা অববাহিকা ব্যতিরেকে দেশের সকল অঞ্চলের মাটির অম্লতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অত্যধিক অম্লযুক্ত জমির পরিমাণ চিহ্নিত হয়েছে প্রায় ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার হেক্টর যা মোট আয়তনের প্রায় ২৭%। অত্যধিক অম্লতা একদিকে যেমন মাটির অধিকাংশ পুষ্টি উপাদানের লভ্যতায় বিঘ্ন ঘটায়, অন্যদিকে মাটিতে মেটাল আয়নকে অধিক পরিমাণে লভ্য করে তোলে এবং ক্ষতিকর ভারী ধাতুর লভ্যতাকেও বৃদ্ধি করে। এ সব ভারী ধাতু ফসলে প্রবেশ করে ফসলের মান হ্রাস করবে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হিসেবে দেখা দিবে (এসআরডিআই)।

সুতরাং মাটিতে জৈব পদার্থ, পুষ্টি উপাদান বা নিউট্রিয়েন্ট, অম্লতা ইত্যাদির তারতম্য ঘটায় মাটির উর্বরা শক্তি ক্রমশঃহ্রাস পাচ্ছে। মাটির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষয়িষ্ণু উর্বরা শক্তি পুনরুদ্ধারে সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্রিয় হতে হবে।

ফসল উৎপাদনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাও মাটির উর্বরা শক্তি ক্রমঃহ্রাসের অপর একটি কারণ। প্রায় প্রতি জেলাতেই এসআরডিআই এর মাটি পরীক্ষার ল্যাব রয়েছে। ল্যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির প্রকৃত অবস্থা জানা যেতে পারে এবং সুপারিশকৃত সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ মাটির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারে BARC প্রকাশিত Fertilizer Recommendation Guide, ডিএই এর ওয়েব সাইট-সেবা বক্স হতে অন-লাইন সার ব্যবহার সুপারিশমালা, রাইস্ ক্রপ ম্যানেজার ইত্যাদির সহায়তাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

লক্ষণীয় যে কোন কোন কৃষক আর্থিক প্রয়োজনে বা ইট ভাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসাধু চক্রের প্ররোচণায় কৃষি জমির উপরিস্তর (টপ-সয়েল) বিক্রয় করে থাকেন, এতে ভূমির উর্বরতা শক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং

ফসলের উৎপাদনশীলতায় বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিএই-কে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৮.২.৬ 'ক্রপ জোনিং' ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন

বাংলাদেশের আয়তন খুব বেশি না হলেও এর ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ফসল উৎপাদনে ভূমির উপযোগিতা, মাটির গুণাগুণ, সেচ পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদি এলাকা ভেদে ভিন্নতর। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্র, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড় দেশের প্রকৃতি ও কৃষি পরিবেশকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পৃথক করে রেখেছে। সামগ্রিক ভিন্নতার কারণে দেশের সকল এলাকা সকল ফসল চাষের জন্য সমান উপযোগী ও সম্ভাবনাময় নয়। সে জন্য প্রয়োজন 'ক্রপ জোনিং' ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত 'Land Suitability Assessment and Crop Zoning in Bangladesh' পুস্তিকাটি এ বিষয়ে সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ডিএই 'ক্রপ জোনিং' ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৮.২.৭ নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন

ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক ইত্যাদির ব্যবহার অতি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব রাসায়নিকের মধ্যে রয়েছে ভেজালের কম/বেশি ছড়াছড়ি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক জানেন না এ সব রাসায়নিকের গুণগত মান, প্রয়োগ মাত্রা ও নিয়ম-বিধি, residual effect এর স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি। কৃষকগণ না জেনেই অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত মাত্রায় এ সব রাসায়নিক প্রয়োগ করছেন। যে সকল ফসল শস্য কর্তনের পর পরই আহার্য সে গুলোতেও কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে না। নিয়ম-বিধি অনুসরণ না করে এ সব রাসায়নিকের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকী কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি প্রচলিত কথা আছে-"Food safety begins on the farm"। ডিএই-কে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.২.৮ গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) কার্যক্রম গ্রহণ

শস্য উৎপাদনে বীজ বোনা থেকে শুরু করে সংগ্রহ/সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম স্বাস্থ্সম্মত হতে হবে ও বিভিন্ন কাজের তালিকা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খাদ্য বাহিত রোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের হুমকী। শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ সকল ক্ষেত্রেই ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস জীবাণু দ্বারা খাদ্য শস্য দূষিত হতে পারে এবং নানাবিধ রোগের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। রন্ধন প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণে ঝুঁকি কিছুটা কম থাকলেও যে সমস্ত খাদ্য শস্য সরাসরি গ্রহণ করা হয় যেমন- ফল সে সকল ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি মারাত্মক। সাম্প্রতিককালে উৎপাদিত খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ডিএই এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে এটি একটি বড় ধরনের ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৮.২.৯ ভূ-গর্ভস্থ সেচ উৎসের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচে গুরুত্বারোপ ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা

তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়- ২০১৪-১৫ বছরে সেচ কাজে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা: গভীর নলকূপ- ৩৬ হাজার ৫ শত, অগভীর নলকূপ- ১৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত ও পাওয়ার পাম্প- ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত (বিবিএস)। অর্থাৎ মোট সেচ যন্ত্রের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে সেচ কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার পাম্প মাত্র ১০.৫৪% এবং গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ মিলিয়ে গড়ে প্রতি বর্গ কি.মি. ১০.৭৫ টি সেচ যন্ত্র ভূ-গর্ভস্থ সেচ পানি উত্তোলনে ব্যবহার হচ্ছে।

তথ্য-উপাত্তে আরো দেখা যায়, শুধু বোরো ফসলে ৮০% সেচ পানির উৎস ভূ-গর্ভ এবং তীব্র শুষ্ক (পিক) মৌসুমে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে সাকুল্য সেচ পানির ৬৩% আসে ভূ-গর্ভ হতে (বিএডিসি)। গৃহস্থালী ও অগৃহস্থালী কাজে বর্ষব্যাপী ব্যবহৃত ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণও কম নয়। সুতরাং ভূ-গর্ভ হতে প্রতি বছর এত বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলন অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এক চরম হুমকীর কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ভূ-গর্ভ হতে ৫৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার উত্তোলিত পানির মাত্র ৯৪% অর্থাৎ ৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার রি-চার্জ হয় (বিএডিসি)। ফলে প্রতি বছরই ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার কারণে ২০০৪ সনের তীব্র শুষ্ক মৌসুমে (মার্চ-এপ্রিল) ৬ হাজার ৭ শত বর্গ কিলোমিটার এলাকার অগভীর নলকূপ সেচ প্রদানের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে, ২০১০ সনে তা ৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৯ হাজার ৭ শত বর্গ কিলোমিটারে পৌঁছে (বিএডিসি)।

ইতোমধ্যে ভূ-গর্ভের পানির স্তর সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে নীচে নেমে যাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার উজানমুখী অনুপ্রবেশ দেখা দিয়েছে এবং লবণাক্ত এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত গতিতে নীচে নেমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে খাদ্য ও পানি সম্পদের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণের হুশিয়ারী বার্তা রয়েছে। এহেন সংকটাপন্ন পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ পেতে হলে ভূ-গর্ভস্থ সেচ পানির নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচ উৎসে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

শস্য বিন্যাস পরিবর্তন ও সেচ পানির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। এক কেজি ধান উৎপাদনে যেখানে ১৫০০-২০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে ৪০০০-৫০০০ লিটার। সেচ পানির প্রয়োগ মাত্রা Crop water requirement থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। ডিএই ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং খাদ্য ও পানি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ পরিবেশের ভারসাম্য সুসংহত রাখতে সচেষ্ট হবে।

১৮.২.১০ চরাঞ্চলে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ

দেশের বড় ও মাঝারী আয়তনের প্রায় ২৩০টি নদ-নদীর মধ্যে অধিকাংশই দুর্দশাগ্রস্থ (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ডিসেম্বর ২০০৩), দুই পাড়ের বিস্তৃর্ণ এলাকা চর। এ সব চর এলাকা কৃষি কাজের জন্য উপযোগী, পলি মাটির আস্তরের কারণে ভূমির উর্বরতা শক্তিও মন্দ নয়, এ সব এলাকায় কৃষি কাজও থেমে নেই। কিন্তু চর এলাকার কৃষিতে রয়েছে কম-বেশি অযত্ন-অবহেলা। চর এলাকা উপযোগী প্রযুক্তি প্রয়োগ ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন চরাঞ্চলে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে - ডিএই এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চরাঞ্চলে বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে যাবে।

১৮.২.১১ নারী সমাজের শক্তিকে কৃষি সম্প্রসারণের সম্পদে রূপান্তর

সৃষ্টির শুরু হতেই নারী কৃষির সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ দিন যাবত নারীদেরকে অধিক মাত্রায় কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্তায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণের জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে, তথাপিও কৃষিতে নারীদের স্থূলকায় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয় নি। যেখানে যতটুকু অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তাতে প্রমান মিলেছে যে নারী তার শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে অনেক পারদর্শী ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং তা কৃষি উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক। ডিএই নারী সমাজের শক্তিকে সম্প্রসারণের সম্পদে পরিণত করার জন্য যথোচিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৮.২.১২ কৃষি বাণিজ্যিকিকরণ

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বেই জোর প্রচেষ্টা- 'কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ'। বাণিজ্যিক কৃষির প্রধান লক্ষ্যই হল- নিজস্ব চাহিদার অতিরিক্ত বাজারমুখী উৎপাদন এবং কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর। FAO শ্রেণিভুক্তকরণে বাণিজ্যিক কৃষক (Commercial farmer) বলতে সে সমস্ত কৃষকদেরই বুঝিয়েছে যারা মোট উৎপাদনের ৫০% এর অধিক বাজারজাত করতে সক্ষম।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষকই বাজারমুখী উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকদের মাঝে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় যে সকল কৃষক টিকে থাকতে পারছেন না তারা কৃষি কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এ কারণেই বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণে ব্যর্থ হলে কৃষি বিমুখ কৃষকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে পারে যা কৃষি প্রধান এ দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

সম্প্রসারণে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের অঙ্গনটি অতি বৃহৎ। সাম্প্রতিককালে সম্প্রসারণের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাজার সংযোগ, value addition, value chain, supply chain ইত্যাদি অনেক গুরুত্ব বহন করছে। ডিএই কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে যথাযথ কর্মকৌশল অবলম্বন করে কৃষি উন্নয়নের ভিত্তি মজবুত করবে।

১৮.২.১৩ ই-সম্প্রসারণ সেবা

ই-সম্প্রসারণ সেবার প্রয়োগ, ব্যবহার এবং জনপ্রিয়করণ এখন সময়ের দাবী। ই-সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে দেশ-বিদেশে নানাবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখন পর্যন্তও সীমিত। ডিএই ই-সম্প্রসারণ সেবা প্রদান কার্যক্রমে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। ই-সম্প্রসারণ সেবার প্রয়োগ ও জনপ্রিয়করণের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এলাকার কৃষকের সঙ্গে ডিএই এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবে, কৃষি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে কৃষকগণ উপকৃত হবেন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সময়ে ই-সম্প্রসারণ সেবায় যেখানে যতটুকু সুযোগ আছে ডিএই-তে কর্মরত সকল সম্প্রসারণ কর্মীগণ তার প্রয়োগ ও ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং আগামী দিনগুলোতে চ্যালেঞ্জের সঙ্গে ই-সম্প্রসারণ সেবা জনপ্রিয়করণে উদ্যোগী হবেন।

১৮.২.১৪ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মনিটরিং ও তদারকি জোরদারকরণ

সাধারণভাবে বলতে গেলে ডিএই এর মনিটরিং ও তদারকি আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। মনিটরিং ও তদারকি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু দুর্বল তা সম্প্রসারণ কর্মী মাত্রই জ্ঞাত আছেন, মনিটরিং ও তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আরও বেশি অবগত। যেখানে যতটুকু কম-বেশি ঘাটতি রয়েছে, ধাপে ধাপে উপরস্থ আসনে উপবিষ্ট কর্মকর্তাগণ তা শক্তিশালীকরণে তাদের কার্য-ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। কোন কাজে সফলতার মূল মন্ত্র মনিটরিং ও তদারকি। মনিটরিং ও তদারকি যত শক্তিশালী হবে উন্নয়নও তত বলিষ্ঠ হবে। আগামী দিনগুলোতে ডিএই এর সকল স্তরে মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

১৮.২.১৫ বসত বাড়িতে ফলের উন্নত জাত প্রতিস্থাপন

লক্ষণীয় যে বসত বাড়িতে যে সমস্ত ফল গাছ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই উন্নত জাত সমৃদ্ধ নয়। ফল হতে অর্থ ও পুষ্টি উভয়েরই যোগান আসে। বসত বাড়িতে উন্নত জাতের ফল গাছ প্রতিস্থাপন ও এগুলোর যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে ফলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে অর্থ ও পুষ্টি যোগানে ডিএই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে অধিকতর অর্থ ও পুষ্টি যোগানের ব্যবস্থা হবে, ডিএই এর মানসম্পন্ন ও স্থায়িত্বশীল কর্মকাণ্ডের বিশেষ দৃষ্টান্তও প্রতিষ্ঠা লাভ হবে।

বসত বাড়িতে বিভিন্ন ফলের উন্নত জাত প্রতিস্থাপন এবং আমের ক্ষেত্রে বয়স্ক গাছকে পুনঃউন্নয়নের (Rejuvenation) কার্যক্রম গ্রহণে ডিএই বিশেষ উদ্যোগী হবে।

১৮.২.১৬ নগর কৃষি উন্নয়ন

বাংলাদেশে ছোট-বড় শহর/নগর অসংখ্য। এ সব শহর/নগর পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শহর/নগরগুলোতে অসংখ্য স্থায়ী স্থাপনা গড়ে উঠছে। নারী কৃষকদের সম্পৃক্ত করে শহর/নগরের পতিত জায়গা বা স্থাপনার ছাদে আধুনিক কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণে ডিএই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১৮.২.১৭ উপর্যুক্ত বিবরণে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ ছাড়াও যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে ডিএই-কে এগিয়ে যেতে হবে তা নিম্নরূপ:

- প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণে উৎসাহিতকরণ
- নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ
- প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় রোধ
- পুষ্টি নিরাপত্তা, গুণগতমান সম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন
- প্রযুক্তি হস্তান্তর, গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ বিতরণ, কৃষি বাজার সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে PPP (Public Private Partnership) শক্তিশালীকরণ
- পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সংহতকরণ
- প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণে প্রতিকূলতা সহনশীল শস্যের জাত জনপ্রিয়করণ
- কর্তনোত্তর ফসলের ক্ষতিহ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ ও এগ্রো-প্রসেসিং এ গুরুত্বারোপ
- দক্ষ কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা
- সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তিসংস্থা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র দৃঢ়ীকরণ
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ
- কৃষি উপকরণ যেমন-বীজ, সার, কীটনাশকের দক্ষ ব্যবহার
- আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে ফসল চাষ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিতকরণ
- এলাকা ও চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
- দক্ষিণাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে ভাসমান প্রযুক্তিতে ফসল উৎপাদন জনপ্রিয়করণ
- দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও মালচিং এর মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিহার করে ফসল উৎপাদন
- খরা প্রবণ ও পাহাড়ি অঞ্চলে মালচিং/Green-covered (Mimosa) পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।